Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-I, October 2025, Page No. 1-9
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.01W.025

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি: পারস্পরিক সম্পর্ক

ড. অতসী মহাপাত্র, *সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.10.2025; Accepted: 22.10.2025; Available online: 31.10.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In ancient Indian Philosophy, three methods of practice have been mentioned for attaining salvation (Moksha), namely, the path of knowledge, the path of action, and the path of devotion. Jnana Yoga for attaining salvation is the knowledge of the Supreme Being. Advaita Vedanta, Nyaya-Vaisheshikas are follows the paths of knowledge. The Samkhya-Yoga philosophy considered that knowledge and action are helpful to attaining salvation. Jain and Buddhist philosophy are the followers of Jnana-Karmasamuchya. The Karma-margis are always interested in attaining the supreme goal by following the path of Karma. The earlier Mimamsakas believed in Karma. Later, the Gita expanded the meaning of Karma and spoke of performing Karma without desire for results. The Bhakti-margis are interested in attaining the supreme goal by adopting the path of Bhakti.Vaishnava Vedantists adopt the path of Bhakti-marga to attain salvation. But there is no opposition between the various paths of Sadhana, i.e., knowledge, Karma and Bhakti, rather they are supportive and complementary to each other. Although the paths are differed according to the inclination, the goal remains one and the same. The ultimate goal of these three paths is Moksha or liberation. The article attempts to provide an idea of the nature of the path of knowledge, the path of action and the path of devotion and their mutual relationship in Indian Philosophy

Keywords: Indian Philosophy, Liberation, Knowledge, Action, Bhakti, Mutual relationship

ভারতীয় দর্শনে পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি উপায় বা পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানের পথ, কর্মমার্গ বা কর্মের পথ এবং ভক্তিমার্গ বা ভক্তির পথ। এদেরকে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বলা হয়েছে (মাল, ২৬০)। এই প্রকার পথনির্দেশ ভারতীয় দার্শনিকদের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচায়ক। মনস্তত্ত্ব অনুসারে দাবি করা হয় মানবমনের তিনটি বৃত্তি রয়েছে যথা চিন্তন বা বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা বা সংকল্প। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই তিনটি বৃত্তি সমানভাবে থাকে না। কোথাও জ্ঞানের প্রাধান্য, কোথাও অনুভূতি, আবার কোথাও ইচ্ছা বা সংকল্প প্রাধান্য পায়। এই তিনটি বৃত্তির তারতম্য অনুসারে মানুষের চরিত্র নির্ধারিত হয়। জ্ঞানমার্গীরা জ্ঞানের পথ অবলম্বন করে পরমার্থ লাভ করার কথা বলে থাকেন। ভক্তিমার্গীরা ভক্তির পথ অবলম্বন করে পরমার্থ লাভে আগ্রহী, আবার কর্মমার্গীগণ কর্মের পথ ধরে পরমার্থ লাভে প্রয়াসী হয়ে থাকেন (শর্মা, ৩৩)। এইভাবে প্রবণতা অনুসারে মার্গ বা পথের ভিন্নতা হলেও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন থাকে। এই তিনটি পথের চরম অভীষ্ট হল মোক্ষ বা মুক্তি। অদ্বৈতবেদান্তী, ন্যায়-বৈশেষিকরা হলেন জ্ঞানমার্গী। সাংখ্য-যোগ দর্শন জ্ঞানমার্গী

হলেও এই জ্ঞান ও কর্মকে মোক্ষলাভের সহায়ক বলে মনে করা হয়। জৈন ও বৌদ্ধরা হলেন জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী। পূর্বমীমাংসকগণ কর্মবাদে বিশ্বাসী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসহ অন্যান্য বৈষ্ণব বেদান্তীরা মোক্ষলাভের জন্য ভক্তিমার্গের পথ অবলম্বন করেন। শ্রীমদভগবদগীতায় বলা হয়েছে জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা যেমন মোক্ষলাভ হয়, তেমনি ভক্তিতেও মোক্ষলাভ ঘটে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে অবিরোধ প্রদর্শনের জন্য গীতায় আরও বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করলে আত্মশুদ্ধি হয় এবং আত্মশুদ্ধি ঘটলেই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। তাই জ্ঞানলাভ করতে হলে শ্রদ্ধাবান এবং ভক্তিমান হতে হয়। আবার আত্মশুদ্ধ না হলে আত্মজ্ঞান হবে না। সুতরাং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং এদের অবিরোধই লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে একটি ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

জ্ঞানমার্গের স্বরূপ:

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশে বেদের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বেদের চারটি ভাগ ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদ। এদের মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড রচিত। কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই যাগযজ্ঞ সম্পাদন করাকেই পুরুষার্থ বলা হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের পথকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বৈদিক ধর্মের দুটি প্রধান শাখা হল কর্ম ও জ্ঞান অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গ। জ্ঞানবাদীরা মনে করেন পরমেশ্বরের জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। নামরূপের যে জগৎ প্রপঞ্চ আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয় তার অন্তরালে যে নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি তত্ত্ব রয়েছে তাই হল পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম। জ্ঞানযোগে তাকেই জানতে হবে। আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন। জীব মায়ামুক্ত হলে এই জগতের জ্ঞান লাভ করে থাকে। একেই 'আত্মজ্ঞান', 'ব্রহ্মজ্ঞান' 'আত্মার ঐক্যসাধন', 'পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান', 'মুক্তি' প্রভৃতি নানা শব্দে বর্ণনা করা হয়। এইভাবে ভারতীয় সাধনায় আত্মশুদ্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ম বিষয়ে জ্ঞানমার্গীদের আপত্তি হল সৎ, অসৎ, সুকর্ম, দুষ্কর্ম সকল প্রকার কর্মই হল বন্ধনের কারণ। কর্মের দ্বারা জীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা জীব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তাই পারদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না। কেননা কর্মমার্গে মুক্তি প্রদান হয় না। আবার, পুণ্যফলে যে স্বর্গসুখ লাভ হয় তা মোক্ষ নয়, কেননা এই প্রকার সুখ অস্থায়ী। যাগযজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা স্বর্গলাভ হলেও তা মোক্ষ প্রদান করতে পারে না। কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বা বন্ধনের কারণ। কর্মফলের জন্য দেহধারণ করতে হয়। আবার দেহধারণ করলে কর্ম অর্থাৎ এই জন্মকর্মচক্র থেকে নিবৃত্তি ঘটে না। জ্ঞানবাদীদের মতে আত্মজ্ঞানই ছাড়া কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। তবে কেউ কেউ আত্ম-অনাত্ম বিচারের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলে থাকেন। আবার, কোন কোন মতে দাবি করা হয় মোক্ষলাভের জন্য যে সব পথের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জ্ঞানের পথ হল সবচেয়ে কঠিন। বস্তুতপক্ষে অন্যান্য পথগুলি অতিক্রম করে এলেই মুমূক্ষু ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করে থাকেন। অর্থাৎ এই পথ সকলের জন্য নয়, সীমিত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্য যারা জ্ঞান ও বুদ্ধির উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছেন তাদের জন্য অনুসরণীয়। তবে এর জন্য প্রয়োজন কিছুদিনের জন্য ধ্যানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ অনুসরণ করা, এই কারণেই বলা হয়েছে জ্ঞানমার্গ হল সকল মার্গের শ্রেষ্ঠমার্গ এবং সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে। মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞানযোগে যে জ্ঞানের কথা বলা হয় তা হল পরমতত্ত্বের জ্ঞান। এই জ্ঞান সাধারণ বিচারমূলক জ্ঞান নয়, তা হল সত্যের অপরোক্ষ অনুভব বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি। পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য যোগের আবশ্যকতা এবং প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে, কেননা মন যদি অস্থির, চঞ্চল এবং অশুচি থাকে তাহলে সেই মনের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। দেহমনের শুচিতা, মানসিক স্থিরতা ও একাগ্রতা কোন তত্ত্বের উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে তোলে। তাই আত্মশুদ্ধি লাভের প্রশস্ত পথ হল যোগসাধনা।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে কর্ম হল অজ্ঞতাপ্রসূত। তাই কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না (ভট্টাচার্য্য, ৩৯) এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় না। আচার্য শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির কোন স্থান নেই। অদ্বৈতবেদান্ত মতে মোক্ষ হল স্বাভাবিক নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ। মোক্ষ কোন নতুন প্রাপ্তব্য অবস্থামাত্র নয়, যাগযজ্ঞের

দ্বারা একে লাভ করা যায় না। মোক্ষ হল আত্মার শাশ্বত রূপ। ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদত্ব হল মোক্ষ। অদ্বৈত মতে বন্ধনের কারণ হল অবিদ্যা। পরমতত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারে (সিনহা, ১৬)। অজ্ঞানতার দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত থাকে। তাই ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানরূপ মায়া সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। মায়ার বিনাশ ঘটলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতার প্রকাশ ঘটে। এইভাবে শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে কর্ম ও ভক্তির কোন স্থান নেই। জ্ঞানেই মুক্তিলাভ ঘটে। তিনি হলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী। তবে তিনি মনে করেন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ (সেন, ৩৭২)। শ্রবণ হল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম ধাপ, এর অর্থ হল গুরুর কাছ থেকে উপনিষদের বাণী শ্রবণ করা। দ্বিতীয় ধাপ মননের অর্থ হল যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি। সবচেয়ে সবশেষে তৃতীয় তথা চরম ধাপ হল নিদিধ্যাসন বা নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান। এর মাধ্যমে পরমব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয় (মাল, ২৬৪)। শঙ্করের মতে মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়। কর্ম জীবকে জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্তুত করে এবং জ্ঞানলাভের পথে যে অন্তরায় তাকে দূর করতে সাহায্য করে। সমস্ত ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে কর্ম করলে, শমদম ইত্যাদি সাধনের অধিকারী হলে এককথায় যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। শুদ্ধাত্ম ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাঁর মতে বিবেক বৈরাগ্য লাভের পর আত্যন্তিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। শুধুমাত্র আচার্য্য শঙ্করই নয়, সকল জ্ঞানবাদীরাই এই অভিমত পোষণ করেন।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞানমার্গের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দর্শন মতে অপবর্গ বা মোক্ষ হল জীবের পরমপুরুষার্থ। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান বা প্রমেয় পদার্থ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাই হল মোক্ষলাভের উপায়। আত্মাকে মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করাই হল মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান হল সকল দুঃখের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে এই মোক্ষলাভ করা যায় এবং এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এগুলির মাধ্যমেই তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হয় এবং জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়। আবার, সাংখ্য-যোগ মতে জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করেই মোক্ষলাভ সম্ভব। সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব একটি নয়, দুটি- পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই অনাদি এবং নিত্য। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, পরিণামী, বিকারশীল, সৃষ্টিশীল। পুরুষ হল নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, উদাসীন। পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্যমান। প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি বিষয় পুরুষ বিষয়ী। পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাই এই সংসার হল দুঃখময়। সাংখ্য মতে পুরুষ এবং প্রকৃতির অবিবেক বা অভেদ জ্ঞান জীবের বন্ধনের কারণ। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হল মুক্তিলাভের উপায়। আত্মা এবং অনাত্মার ভেদজ্ঞান হল বিবেকজ্ঞান। এই বিবেক জ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি হল মুক্তিলাভের উপায় (বাগচী, ২৪১)। সেজন্য যোগদর্শনে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ মোক্ষসাধনের পথ হিসাবে অষ্টযোগাঙ্গ পালনের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে মোক্ষলাভের জন্য সাংখ্য-যোগ দর্শনে জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের উপরেও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এই দুটি দর্শন জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয়বাদী (ভট্টাচার্য্য, ৩৮)।

বৌদ্ধদর্শনে জীবের পরমার্থ হল নির্বাণ। নির্বাণ বলতে বোঝায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা চিরমুক্তি লাভ। জীবের বন্ধনের কারণ হিসেবে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র বা সংসার চক্রের উল্লেখ করা হয়েছে (সেন, ৮১)। এই আবর্তন থেকে মুক্তি বা নির্বাণের জন্য বুদ্ধদেব আটটি মার্গের অনুশীলনের কথা বলেছেন। এগুলি হল সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি রূপের বর্ণনা করা হয়েছে (ভট্টাচার্য্য, ৩৮)। প্রজ্ঞা হল সম্যক জ্ঞান, এটি অবিদ্যার বিনাশ করে। সকল প্রকার পাপমূলক কর্ম থেকে বিরত থেকে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে কর্ম সম্পাদন করা হল শীল। এই শীলের সহায়তায় মন পবিত্র ও প্রশান্ত হয় এবং জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি জাগ্রত হয়। এর ফলে নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করার প্রবৃত্তি জাগে। অষ্টাঙ্গিক মার্গে এইভাবে কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ দর্শনে লক্ষ্য বা নির্বাণ লাভের জন্য জ্ঞানমার্গ ও কমমার্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে (দাসগুপ্ত, ৭৫)। তাই বৌদ্ধরা হলেন জ্ঞান কর্মসমুচ্চয়বাদী। আবার জৈন মতে আত্মা স্বরূপত মুক্ত এবং এই অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। মোক্ষলাভ হলে কর্মের শক্তি বিনষ্ট হয়। মোক্ষলাভের পথ হল সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং

সম্যক চরিত্র। এই তিনটিকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। (সেন, ৭৩)। জৈনশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হল সম্যক দর্শন। আত্মা-অনাত্মা, বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ ও নিঃসন্দিদ্ধ জ্ঞান হল সম্যক জ্ঞান এবং পঞ্চমহাব্রত পালন সম্যক চরিত্র। পঞ্চমহাব্রত বলতে বোঝায় অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। কর্মের বাধা দূরীভূত হলে আত্মার অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত আনন্দের প্রকাশ ঘটে। জৈন মতে মোক্ষলাভ ভক্তি বা জ্ঞান বা কর্মপথে লভ্য নয়। এই দর্শনেও কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তারা জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে মোক্ষলাভের পন্থা বলে স্বীকার করেন। তবে জ্ঞানবাদীদের মতে, আলো-অন্ধকার, জ্ঞান-অজ্ঞান, গতি ও স্থিতি যেমন একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি কর্ম ও জ্ঞান সেইরূপ একত্রে থাকতে পারে না। কর্ম মায়া বা অজ্ঞতাপ্রসূত। কাজেই কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ সম্ভব নয়।

কর্মযোগের স্বরূপ:

বৈদিক সভ্যতা প্রধানত ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ঋকবেদের মন্ত্রগুলির সমস্তই ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইসব মন্ত্রের দ্বারা প্রাচীন আর্যগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন এবং অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন। তবে ঋকবেদ প্রধানতঃ যজ্ঞপ্রধান হলেও এতে কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনা এই তিনটি সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ঋকবেদের ঋষিগণ জগৎ প্রপঞ্চের অতীতে এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছিলেন। ওই অদ্বয়, অব্যক্ত তত্ত্ব যে এক ও অদ্বিতীয়, ঈশ্বর এবং দেবতারা যে ঐশীশক্তির বিকাশ একথা ঋকবেদের ঋষিদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে বেদে তত্ত্ববিচার এবং দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের অভাব ছিল না। তবে বেদে কর্মই হল প্রধান চিন্তা, তত্ত্ববিচারের স্থান ছিল গৌণ। কেননা সনাতন ধর্মে যাগযজ্ঞাদির প্রাধান্য ক্রমশ বাড়তে থাকলে বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণ কর্মপ্রধান হয়ে ওঠে। ঋক, সাম, যজু এই তিনটি বেদেরই বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেদের ব্রাহ্মণভাগ এইসব যাগযজ্ঞের বিস্তৃত বিধি ও নিয়মে পরিপূর্ণ। তবে, মীমাংসকরা বেদের কর্মকাণ্ডের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাতে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। প্রাচীন মীমাংসক মতে, স্বর্গলাভই হল জীবের পরমার্থ। স্বর্গ হল অনন্ত সুখের আলয়। বেদবিহিত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। বেদনির্দেশিত বলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানই জীবের একমাত্র ধর্ম (ব্যানার্জী, ৯২)। বেদ নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ এবং অপৌরুষেয়। বেদবিহিত কর্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ব মীমাংসকরা বিশ্বাস করেন কর্ম সর্বশক্তিমান এবং কোন ব্যক্তি কর্মের শক্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে কোন কর্ম হিংসাত্মক কিংবা অহিংসক যাই হোক না কেন কর্মানুষ্ঠানের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাই কর্মের স্বরূপ নির্ণয় করে। এই কারণে বেদবিহিত যাগযজ্ঞে পশুবধ হিংসাত্মক কার্য হলেও অধর্ম বলে বিবেচিত হয় না। কারণ যজ্ঞ হল একটি পুরুষার্থ এবং পশুটিকে যজ্ঞে উৎসর্গ করা হচ্ছে। মীমাংসা মতে কর্ম হল বেদবিহিত, এটি ঈশ্বরের কোন আদেশ নয়। বৈদিক বিধি অনুসারে কর্ম করাই হল ধর্ম এবং তাই হল জীবের পক্ষে সৎকর্ম এবং কর্তব্যকর্ম। মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার দেবতার প্রসঙ্গ উত্থিত হলেও এখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় মাত্র। তাঁদের মতে যাগ-যজ্ঞ বেদবিহিত। এইরূপ মনে করেই যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা পুরষ্কারের লোভে নয়।

মীমাংসা দার্শনিকরা কর্মকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন যথা- নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্যকর্ম। যে কর্ম প্রতিদিন করা প্রয়োজন তাহল নিত্যকর্ম। যেমন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করা। কোন বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম করা হয় তা হল নৈমিত্তিক কর্ম যেমন চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণের সময় স্নান করা। কোন নির্দিষ্ট ফললাভের জন্য যে কর্ম করা হয় তা হল কাম্যকর্ম, যেমন, স্বর্গলাভের জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান। মীমাংসা মতে নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম বাধ্যতামূলক এবং এই কর্ম বেদবিহিত বলেই সম্পাদন করতে হবে, অন্য কোন কারণে নয়। কুমারিল ভট্টের মতে, পুনর্জন্মই হল দুঃখ-কষ্টের কারণ এবং এই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি হল মোক্ষ। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞান হলে এবং পূর্বের সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে কর্মের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে মোক্ষলাভ ঘটে। তাঁর মতে নিষেধমূলক কর্ম করা বা ফলাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম করা কোনটাই মুমূক্ষূ ব্যক্তিদের উচিত কাজ নয়। এই দুই কর্ম নতুনভাবে বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। এইরূপ কর্ম সম্পাদন করলে দুঃখের উৎপত্তি ঘটে। মুমূক্ষূ ব্যক্তি শুধুমাত্র নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় প্রকার বাধ্যতামূলক কর্ম সম্পাদন করেন। বস্তুতপক্ষে এটি গীতার নিষ্কাম কর্ম ছাড়া

আর কিছু নয়। জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ নয়, পুনর্জন্ম রোধ করার জন্য কর্মকে পরিচালিত করতে জ্ঞান জীবকে সাহায্য করে। কুমারিল ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন জ্ঞান এবং কর্ম দুই হল মোক্ষের জনক। কুমারিলের মতো শালিকনাথও মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান এবং আত্মজ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মবাদীগণ পরমার্থ লাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাগ, দ্বেষমুক্ত হয়ে যে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাই হল নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম বিষয় অনুরাগ ও বন্ধনের সৃষ্টি করে, যার জন্য জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। কিন্তু নিষ্কাম কর্মসম্পাদনে বিষয় অনুরাগের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে পুনর্জন্ম লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ঋকবৈদিক যুগে কর্ম বলতে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্মকে বোঝায়।

পরবর্তীকালে গীতায় কর্মের অর্থকে সম্প্রসারিত করে এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জিত করে মীমাংসাকদের স্বর্গপ্রদ কাম্যকর্মকে মোক্ষপ্রদ বিশুদ্ধ নিষ্কাম কর্মে পরিণতি লাভ করে। গীতার কর্মযোগ হল নিষ্কাম কর্মযোগ (ভট্টাচার্য্য, ২১)। জীব অনাসক্ত হয়ে, কর্মের ফলাফলে উদাসীন হয়ে, সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হয়ে এবং সর্বকর্মফল ঈশ্বরের সমর্পণ করে যদি কর্ম করা হয় তাহলে সেই কর্মে কোন বন্ধনে সৃষ্টি হয় না। গীতায় যোগস্থ হয়ে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাই হল যোগ। যে ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করতে পারে তার পক্ষেই হর্ষ বিষাদশূন্য করে কাজ করা সম্ভব। সেজন্য ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করে কর্ম করতে হবে। তবে জ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ কর্মকে মোক্ষপ্রদ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কর্ম পরিত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে বিচরণ করলে মোক্ষলাভ সম্ভব, গীতায় বলা হয় দেহধারী জীব কখনই একেবারে কর্মত্যাগ করে থাকতে পারে না। প্রকৃতির গুণে বাধ্য হয়ে সকলকেই কর্ম করতে হয়। কর্ম যখন করতেই হবে তখন অনাসক্তভাবে কর্ম করা উচিত। কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মোক্ষলাভ করা যায়। গীতায় কর্মযোগের তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, যথা ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জন, 'আমি করছি' এই কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে এবং নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন (গুপ্ত, ৫৬)। এইভাবে কর্মযোগ অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তি তার ধর্ম অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম নিরাসক্তভাবে সম্পাদন করবেন। সকল কর্ম নিরাসক্তভাবে সম্পন্ন করলেই কর্মযোগের সূচনা হয়। এই কর্মযোগ আত্মশুদ্ধি এবং আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে কর্মযোগীকে মোক্ষের পথে চালিত করে। কর্মযোগীগণ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করে থাকেন। নিরাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদন করার জন্য কর্মযোগীর অহংভাব বিলুপ্ত হয়, যার ফলে তাঁর আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে শুদ্ধ চেতনা রূপে প্রকাশিত হয়।

তবে কর্মমার্গ মোক্ষপ্রদ হলেও তা সহজ মার্গ নয়; তা খুবই কঠিন। কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক কামনা বাসনা মুক্ত হয়ে, হর্ষবিষাদশূন্য হয়ে বিশেষত অহংভাব বর্জন করে কর্ম করা কঠিন। সেই কারণে অনেকে মনে করেন উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম করা বাস্তবে সম্ভব নয়। এমনকি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই জাতীয় কর্ম সম্পাদন করা অসম্ভব। এর উত্তরে দাবি করা হয় নিষ্কাম কর্ম উদ্দেশ্যবিহীন নয়, বরং এটি আত্মস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যবর্জিত। অপরের সুখসাধনের জন্য যেসব কর্ম করা হয় সেইগুলির পশ্চাতে সবসময় কর্মকর্তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি থাকে না। সেজন্য অনাসক্ত কর্মের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে এই জাতীয় কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও এর সম্পাদন সহজ কাজ নয়। এইভাবে কর্মযোগের পথে যেসব বাধা দেখা যায় সেগুলিকে তিনভাবে দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারে যথা- ১. রাজযোগের দ্বারা; বিশেষত যম, নিয়ম এবং প্রত্যাহারের মাধ্যমে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে অপসারিত করা। যোগাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির অহংভাব দূরীভূত হয় এবং ব্যক্তি আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার থেকে শুদ্ধ সচেতন সত্তা রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ২. ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ব্যক্তিকে রিপুর হাত থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে এবং ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বর অভিমুখী করতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত স্থির করতে পারলেই, ভক্তিযোগে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করলে রাগ দ্বেষ, কামনা-বাসনা সবকিছু দূরীভূত হয়। সবশেষে আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং কর্মযোগী ইন্দ্রিয় দমনে এবং অহংকার বর্জন করতে সমর্থ হয়। এইভাবে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের পক্ষে সহায়ক। গীতার কর্মযোগে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে অবিরোধ প্রদর্শিত হয়েছে এবং এদের সমন্বয় স্বীকৃত হয়েছে। কর্মত্যাগ না করে কর্মফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও কর্মফলের বাসনা থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ করা হয়েছে ভগবদগীতায়।

ভক্তিমার্গের স্বরূপ:

মীমাংসকদের কর্মযোগ, অদ্বৈতবেদান্তীদের জ্ঞানযোগ কিংবা পতঞ্জলির ধ্যানযোগ বা রাজযোগে ভক্তির কোনো স্থান নেই। কেননা এইসব ভাবনায় ঈশ্বরতত্ত্বের স্থান অতি গৌণ এবং প্রায় অস্বীকৃত। অদ্বৈতবেদান্তসম্মত ব্রহ্মবাদে ভক্তির স্থান নেই; কারণ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ, নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগৎ স্রষ্টা, ঈশ্বর, প্রভু প্রভৃতি কোনোভাবেই বর্ণনা করা যায় না, কেননা এরূপ ধারণা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। এমনকি তাঁর সঙ্গে ভাবভক্তির কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁকে সাধারণ মানুষকে যতটা নয় হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায় ততখানি বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চায় না। এর ফলে এসে পড়ে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা; ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের কথা। প্রসঙ্গত বলা যায় দর্শনের দৃষ্টিতে যা চরমতত্ত্ব, ধর্মের দৃষ্টিতে তাই ঈশ্বর বা ভগবান। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জীবের উপাস্য দেবতা। উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। এই শাস্ত্রে 'তৎ' শব্দের দ্বারা নির্গুণ এবং 'সঃ' শব্দের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভক্তিমার্গ বেদ উপনিষদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং পরে অবতারবাদ এবং প্রতিমা পূজার প্রবর্তন হলে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। পৌরাণিক অবতার তত্ত্ব, প্রতীকের উপাসনা, মূর্তিপূজা এবং ইষ্টমূর্তির পূজা প্রভৃতি নানা ধরনের ধারণা ভক্তিমার্গের আবশ্যক অঙ্গ।

ভক্তিমার্গের প্রায় সব উপাসক সম্প্রদায় নির্গুণ ব্রহ্মের পরিবর্তে ভক্তের ভগবান রূপে উপাস্য হিসাবে স্বীকার করেন। তাই এই মার্গে অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন উপযোগিতা নেই। জ্ঞানবাদীদের মোক্ষে ভক্তির কোন স্থান নেই। ভগবান হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই ভগবানই নির্গুণভাবে অচিন্ত্য, ভগবান হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই ভগবান নির্গুণভাবে অচিন্ত্য, অব্যয় ও অক্ষয় ব্রহ্ম। সগুণভাবে তিনি হলেন বিশ্বরূপ, জগতে পিতা-মাতা, প্রভু, বন্ধু প্রভৃতি। তিনি হলেন প্রকৃতির অধীশ্বর, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির এবং সকল জাতির সকল কর্মের নিয়ামক। এককথায় সগুণ ও নির্গুণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সবকিছুর কর্তা হলেন ভগবান বা ঈশ্বর। জ্ঞানীর কাছে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে যিনি চিৎ আত্মাস্বরূপ, ভক্তের কাছে তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রবণ, মনন প্রভৃতি জ্ঞানমার্গের সাধনার দ্বারা, প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগের দ্বারা কর্মযোগে যার সাধনা করা হয় ভক্তিমার্গে উপাসনার দ্বারা তাঁকেই সাধনা করা হয়। উপাসনা হল ভক্তিমার্গের প্রাণ। ভক্তিবাদীরা মনে করেন জ্ঞানমার্গের উপাসনা বা ব্রহ্মচিন্তা প্রত্যক্ষগম্য নয়; সেই কারণে তা ক্লেশদায়ক হতে পারে। কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। তাই এই প্রকার মার্গ সুখসাধ্য। ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণে, অনন্য ভক্তিযোগে, জীবের ভগবানে আত্মসমর্পণে জীবের বদ্ধদশা দূর হয়। ভক্তিবাদীদের মতে ঈশ্বর প্রাপ্তি হল মোক্ষ বা পরম পুরুষার্থ (সেন, ৪০৫)। মুক্ত পুরুষদের মতো ভক্তের স্বরূপ বিলোপের কোন আশঙ্কা থাকতে পারে না।

ভক্তিবাদীদের মতে মোক্ষলাভের জন্য স্বীকৃত সাধনমার্গগুলির মধ্যে ভক্তিমার্গ অনেক বেশি সহজ সরল এবং সুখসাধ্য; কারণ অনুরাগ বা ভালোবাসা হল মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ। এই আবেগের উপর ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত (লাল, ২৬৩)। এই মার্গের ক্ষেত্রে এই অনুরাগ বা প্রেম ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়। ভক্তিযোগের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন রাজযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এই কথা অনেকেই স্বীকার করেন। কারণ ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জাগরিত হয় না। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ তখনই ব্যক্তির মনে জাগ্রত হয় যখন ব্যক্তি জানে ও বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর করুণাময়, প্রেমময় এবং জীবের কল্যাণকামী (লাল, ২৬৩)। এই প্রকার বিশ্বাস বা জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে দুভাবে আসতে পারে যথা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ব্যক্তির বিচারমূলক জ্ঞান থেকে এবং শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ থেকে। কিন্তু যদি মন অশুচি, চঞ্চল ও অস্থির থাকে তাহলে কোনো অবস্থাতেই ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যক্তির মনে জাগতে পারে না কিংবা স্থায়ী হতে পারে না। দেহমনের শুচিতার জন্য প্রয়োজন অষ্ট যোগাঙ্গ অভ্যাস ও রাগ হিংসা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে মনকে পবিত্র করা এবং পবিত্র মনে কর্ম সম্পাদন করা। ব্যক্তির দেহ মন যখন শুচিতা অবলম্বন করে তখন সে শাস্ত্রবাক্য পাঠ করে এবং গুরু উপদেশ শ্রবণ করে, তবে তার মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত হয়। এইভাবে ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না (বাগচী, ৩১২)।

ভক্তি কোন লৌকিক চিত্তবৃত্তি নয়। অনুরাগ হল ভক্তির স্বরূপ। এটি হল পরম দিব্যভাব। ভক্তি হল ভগবানের স্বরূপশক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি। শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার ভক্তিসাধনার কথা উল্লিখিত হয়েছে যথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, বন্দনা, অর্চনা, দাস ও আত্মনিবেদন। ঈশ্বর হলেন একমাত্র আশ্রয়; সকল অগতির গতি- এই প্রকার মনোভাব অবলম্বন করে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই হল ভক্তিমার্গের একটি প্রধান ভাব। তবে ভক্তিমার্গের আরও একটি উচ্চতর ভাব হল 'তুমিই আমার'। এটি হল প্রেমভক্তি বা বিশুদ্ধ প্রেম। এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটে। ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁকে ভালোবাসা অভিন্ন নয়। শুধুমাত্র জানার তুলনায় আমার বলে জানাটা হল আরও গভীরভাবে জানা। তাই জ্ঞানমিশ্রিতভক্তি ভক্তির কোন শেষ কথা নয়। জ্ঞানমিশ্রভক্তি থেকে প্রেমভক্তিতে উত্তীর্ণ হতে গেলে চিত্তকে ঐশ্বর্য জ্ঞান মুক্ত করতে হবে অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি আনতে হবে। শুদ্ধাভক্তি আনে প্রেম, অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির পরেই আসে প্রেমভক্তি। এইভাবে ভক্তিমার্গে আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরের কৃপালাভের কথা প্রকাশিত হয়; যেখানে বলা হয় ঈশ্বরে শরণ নেওয়ার কথা। ভক্ত যদি সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ নেয়, তাহলে তিনি মায়ামুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে পেতে পারেন। তাই ভক্তিবাদীদের কাছে মোক্ষ ছাড়া আরও একটি পুরুষার্থ আছে তাহলে প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তির প্রথম কথা হল শ্রদ্ধা। এর থেকে ক্রমশ শুচি, রাগ, ভাব ও নির্মল প্রেমের বিকাশ ঘটে। প্রেমভক্তির গাঢ়তা অনুযায়ী ভক্তির বিভিন্ন স্তর বর্তমান যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, পিতৃ-মাতৃভাব ও মধুর (প্রভুপাদ, ০৭)। এদের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর মহত্তর।

ভক্তির পথ হল আত্মোপলব্ধি এবং এটি ঈশ্বর উপলব্ধির অগ্রগতির পথ (লাল, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ২৬৩)। এই পথে ঈশ্বর অনুরাগ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হয়। নিম্নস্তর হল গৌণ ভক্তির স্থান। এই স্তরে ব্যক্তির ঈশ্বর অনুরাগের সঙ্গে আত্মানুরাগ মিশে থাকে। ব্যক্তি নিজের কিছু লাভ করার জন্য ঈশ্বর উপাসনায় ব্রতী হয়। এছাড়া ভক্তির আরও একটি উন্নত স্তর আছে যেটি হল পরাভক্তি বা প্রেমের স্তর। দীর্ঘকাল যাবৎ ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হয়। এই স্তরে মোক্ষকামী ব্যক্তি নিজের জন্য কোনকিছুই কামনা করে না। ঈশ্বর হলেন তার একমাত্র ধ্যানের বস্তু এবং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। একে আর্তপ্রপত্তি বলা হয়। এইভাবে ভগবৎ শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ হল ভক্তিযোগের সারকথা। বৈষ্ণব বেদান্ত দর্শনসমূহের বিশেষত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সাধন মার্গ হিসেবে ভক্তির কথা বলা হয়েছে (দাশগুপ্ত, ৭৭)। তাঁর মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হল জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করাকে রামানুজ 'আত্মপ্রপত্তি' বলেছেন। এর অভাব হলে ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায় না। ঈশ্বরের প্রপত্তি বা আত্মনিবেদনই মুক্তির সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। নিরন্তর প্রীতির সঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান করাই হল ভক্তি। ভক্তি যখন গাঢ় হয়ে পরাভক্তি এবং প্রেমে পরিণত হয় তখন এই ভক্তের ভগবানকে লাভ করার ইচ্ছা এক অদম্য আকুলতার রূপ গ্রহণ করে। ভক্ত যখন ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, নিরন্তর প্রেমময় ঈশ্বরের ধ্যান করেন তখন ভক্তের ঈশ্বর লাভ ঘটে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বর প্রসাদে ভক্তের মধ্যে পূর্ণজ্ঞানের উদ্ভব হয়। ঈশ্বর অনুগ্রহে তখন জীব সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত হয়। রামানুজের মতে ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা, ভগবদ্ভক্তি সবকিছুই হল সমার্থক। ভক্তি এবং শরণাগতিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়। আবার মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদ স্থাপন করে ভক্তিবাদের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। তাঁর মতে ভক্তি হল চরমনিষ্ঠা। ঈশ্বর এবং জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। আবার দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থক নিম্বার্ক তাঁর সাধনমার্গে রাধাকৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেছেন। তিনি বলেন শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও জগতের আদি কারণ। ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হতে পারে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বল্লভও মোক্ষলাভের জন্য ভক্তিমার্গকেই যথার্থ সাধন পথ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। পরবর্তীকালে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের প্রবর্তক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে সাধন পথ হল জ্ঞান কর্ম বিবর্জিত বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ। শ্রীচৈতন্য ভক্তিহীন জ্ঞানলাভ ও কর্মমার্গ সম্পূর্ণ পরিহার করে প্রেমভক্তি ও হরিনাম প্রচার করার পক্ষপাতী ছিলেন (শর্মা, ৩৮১)।

কেউ কেউ দাবি করেন ভক্তি হল মোক্ষলাভের সহজতম উপায়। ভক্ত বলতে বোঝায় সেবককে। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হল 'ভক্তি' শব্দের প্রচলিত অর্থ। নিষ্কাম কর্ম করে যেমন আত্মশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে তেমনি ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করেও ঈশ্বরের কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং কর্ম ও

ভক্তি একই তাৎপর্য প্রকাশ করে। ভক্তিবাদীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন এই ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব। ভক্তির মধ্যে জ্ঞানের স্থান আছে অর্থাৎ ভক্তি সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। ঈশ্বরকে জানলেই তাঁর ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করলেই তাঁর প্রতি আত্যন্তিক নির্ভরতার ভাব আসে। তাছাড়া ঈশ্বরকে জানলে তাঁর প্রতি ভয়ের কোনো আশঙ্কা থাকে না। ঈশ্বর তাঁর প্রেমময় রূপ ভক্তকে আকৃষ্ট করে, ভক্তের মনে জাগে ভগবৎ প্রেম। প্রেমেই ভক্তির সার্থকতা। তবে ঈশ্বরের কৃপা না হলে মুক্তি অসম্ভব। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই ভগবৎ প্রেমের অধিকারী হতে পারে। ভক্তিবাদীরা প্রেমকে অনুরক্তি বা ভক্তি বলে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম থেকে অভয়প্রদ মুক্তি লভ্য হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের কথা বেদেও পাওয়া যায়। তবে ভক্তিবাদীদের ধারণা ভক্তেরা যদি সত্যই আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হন, তবে ঈশ্বরও অনুরূপভাবে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। এটি হল ভগবৎলীলা। এইভাবে শরণাগতি হল ঈশ্বর ভক্তির মূলকথা।

প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন সাধনমার্গ যথা জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং তারা পরস্পরের সহায়ক এবং পরিপূরক; কেননা সবকটি সাধনপথের লক্ষ্য একটাই; তা হল মোক্ষ বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মাধ্যমে আত্মার যে স্বরূপ উপলব্ধি হয় তা হল এক অভিন্ন বস্তু। এটি হল শুদ্ধচেতনা। তাছাড়া সাধনপথগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজযোগে আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম-অনুশীলন অন্যান্য যোগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আবার ঈশ্বরের ধ্যান ও ঈশ্বরের ভক্তি রাজযোগের যোগাভ্যাসের অন্তর্গত। রাজযোগে যে ধ্যানের শিক্ষা দেওয়া হয় তা ভক্তিযোগের এবং জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান এবং ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ কর্মযোগকে সহজসাধ্য করে তোলে। আত্মা ও ঈশ্বরের জ্ঞান এবং নিরাসক্তভাবে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন ভক্তিযোগের পক্ষে অপরিহার্য। সবশেষে জ্ঞানযোগের জন্য অন্যান্য যোগের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। কাজেই বিভিন্ন সাধন পথের মধ্যে ঐক্য বর্তমান এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত (চ্যাটার্জী, ১৫৩)। শ্রীমৎভগবদগীতায় আপাতবিরোধী জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সুসংগত সমন্বয় ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এটি হল গীতার পূর্ণাঙ্গ যোগ। গীতার সাধনমার্গকে ভক্তিযোগ বলা হয়। এতে কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান ভক্তিযোগের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছে (মাল, ২৬৬)। গীতা মতে ফলাশক্তি এবং কর্তৃত্বের অভিমান হল বন্ধনের কারণ। আসক্তি এবং অহংবুদ্ধি ত্যাগ করে, ফলাফলে উদাসীন হয়ে কর্ম সম্পাদনে বন্ধনের সৃষ্টি হয় না। আবার আত্মজ্ঞান ছাড়া আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। সুতরাং কর্মযোগে সিদ্ধিলাভের জন্য জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। আত্মজ্ঞান লাভ হলে ভগবানে পরাভক্তি জন্মায়। এইভাবে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সংযোগে সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করে। যিনি সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে 'তাঁর ভৃত্য স্বরূপ হয়ে কাজ করছেন'- এই জ্ঞানে কর্ম সম্পাদন করেন তিনি হলেন পরমভক্ত। সুতরাং কর্মযোগই ভক্তিযোগ। ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি গীতায় এই চারটি বিভিন্ন সাধনপথের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে জ্ঞানকর্মমিশ্র ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য থাকলেও এর যেকোন একটি মার্গে সাধন আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়; কেননা, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মার্গের শেষ ফল বা অভীষ্ট লক্ষ্য হল এক ও অদ্বয় তত্ত্বের উপলব্ধি। বস্তুতপক্ষে গীতার এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলে মান্যতা প্রদান করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. গুপ্ত, দীক্ষিত। *নীতিবিদ্যা ও ফলিত নীতিবিদ্যা*। সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩।
২. চ্যাটার্জী, অমিতা। *ভারতীয় ধর্মনীতি*। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৪।
৩. ব্যানার্জী, সর্বানী (সম্পা)। *প্রসঙ্গ পুরুষার্থ*। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১০।
৪. বাগচী, দীপক কুমার। *ভারতীয় দর্শন*। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৯৭।
৫. ভট্টাচার্য্য, সমরেন্দ্র। *সাম্মানিকী নীতিবিদ্যা*। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪।
৬. সেন, দেবব্রত। *ভারতীয় দর্শন*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, ১৯৭৪।
৭. স্বামী প্রভুপাদ। *শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ*। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, ২০০৭।

৮. Dasgupta, S.N. *A History of Indian Philosophy*. 1st Indian Edition, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1975.

৯. Hiriyanna, M. *Outlines of Indian Philosophy*. 1st Indian Edition, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1993.

১০. Mal. B. A *Story of Indian Culture*. Bishwa Bandhu Research Institute, Hossipur, 1956.

১১. Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy* (Vol 1). Reprint, George & Unwin Ltd., London 1948.

১২. Sharma, C. D. A *Critical Survey of Indian Philosophy*. Reprint, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2003.

১৩. Sinha, J.N. *Outlines of Indian Philosophy*. New central Book Agency, Kolkata, 2006.